

অরক্ষণের নিমন্ত্রণ

(গল্পগ্রন্থ – জন্ম ও মৃত্যু)

এক একজন লোকের স্বভাব বড় খারাপ, বকুনি ভিন্ন তারা একদণ্ডও থাকতে পারে না, শ্রোতা পেলে বকে যাওয়াতেই তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। হীরেন ছিল এই ধরনের মানুষ। তার বকুনির জ্বালায় সকলে অতিষ্ঠ। আপিসে যারা তার সহকর্মী, শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকের স্নায়ুর রোগ দেখা দিলে, অনেকে চাকরি ছাড়বার মতলব ধরলে।

সব বিষয়ের প্রতিভার মতই বকুনির প্রতিভাও পৈতৃক শক্তির আবশ্যিক রাখে। হীরেনের বাবার বকুনিই ছিল একটা রোগ। শেষ বয়সে তাঁকে ডাক্তারে বারণ করেছিল, তিনি বেশি কথা যেন না বলেন। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন—তবে বেঁচে লাভটা কি ডাক্তারবাবু? যদি দু-একটা কথাই কারো সঙ্গে বলতে না পারলুম। কথা বলতেবলতেই হৃৎপিণ্ড দুর্বল হবার ফলে তিনি মারা যান—মার্টার টু দি কজ!

এ হেন বাপের ছেলে হীরেন। বাইশ বছরের যুবক—আপিসে কাজ করে—আবার রামকৃষ্ণ মঠেও যাতায়াত করে। বিবাহ করবার ইচ্ছা নেই। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। এতদিন হয়েও যেত, কিন্তু রামকৃষ্ণ আশ্রমের লোকেরা এ বিষয়ে তাকে বিশেষ উৎসাহ দেননি; হীরেন সন্ন্যাসী হয়ে দিন রাত মঠে থাকতে শুরু করলে এক মাসের মধ্যেই মঠ জনশূন্য হয়ে পড়বে।

হীরেনের এক বৃদ্ধা পিসিমা থাকতেন দূর পাড়াগাঁয়ে। স্টেশন থেকে দশ-বারোক্রোশ নেমে যেতে হয় এমন এক গ্রামে। পিসিমার আর কেউ নেই, হীরেন সেখানে পিসিমাকে একবার দেখতে গেল। বুড়ী অনেকদিন থেকেই দুঃখ করে চিঠিপত্র লিখছিল।

সে গ্রামের সবাই এতদিন জানতো যে, তাদের কুমী অর্থাৎ কুমুদিনীর মতো বকুনিতে ওস্তাদ মেয়ে সে অঞ্চলে নেই। কুমীর বাবা গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন কিন্তু যেখানে যখন পূজো করতে যেতেন, আগুড়ম বাগুড়ম বকুনির জ্বালায় যজমান ভিটে ছেড়ে পালাবার যোগাড় করতো, বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হবার উপক্রম হত।

কুমীর বাপের বকুনি-প্রতিভার একটা বড় দিক ছিল এই যে তাঁর বকুনির জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন হত না। যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক না কেন, তিনি তাই অবলম্বন করে বিশাল বকুনির ইমারত গড়ে তুলতে পারতেন। মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বলবার ও ছবি গড়বার ক্ষমতা না থাকলে মানুষে এমন বকতে পারে না বা শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর সময়ে গ্রামের সকলেই দুঃখ করে বলেছিল—আজ থেকে গাঁ নিঝুম হয়ে গেল।

দু-একজন বলেছিল—এবার আমসত্ত্ব সাবধানে রৌদ্রে দিও, মুখুয্যে মশায় মারা গিয়েছেন, কাক-চিলের উৎপাত বাড়বে। অর্থাৎ তাদের মতে গাঁয়ে এতদিন কাক-চিল বসতে পারত নামুখুয্যে মশায়ের বকুনির চোটে। নিন্দুক লোক কোন্ জায়গায় নেই?

কিন্তু হায়! নিন্দুকের আশা পূর্ণ হয়নি বা মুখুয্যে মশায়ের হিতাকাঙ্ক্ষীদের দুঃখ করবারও কারণ ঘটেনি। মুখুয্যে মশায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আট বৎসরের মেয়ে কুমীকে। পিতার দুর্লভ বাক-প্রতিভার অধিকারিণী হয়েছিল মেয়ে। এমনকি তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই সন্দেহ করলেন যে, মেয়ে তার বাপকে ছাড়িয়ে না যায়।

সেই কুমীর বয়েস এখন তেরো-চোদ্দ। সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল মাথায়, বড় বড় চোখ, মিষ্টি গলার সুর, একহারা গড়ন, কথায় কথায় খিল-খিল হাসি, মুখে বকুনির খই ফুটছে দিন-রাত।

শুভক্ষণে দু'জনের দেখা হল।

হীরেন সকালবেলা পিসিমার ঘরের দাওয়ায় বসে প্রাণায়াম অভ্যাস করবার চেষ্টা করচে, এমন সময়ে পিসিমা আপন মনে বললেন—দুধ কি আজ দিয়ে যাবে না? বেলা যে তেতপ্পর হল—ছেলেটা যে না খেয়ে শুকিয়ে বসে আছে, একটু চা করে দেবতার দুধ নেই—আগে জানলে রাত্রো বাসী দুধ রেখে দিতাম যে—

—রাতের বাসী দুধ রোজ রাখো কিনা—

বলতে বলতে একটি কিশোরী একঘটি দুধ-হাতে বাড়ির পেয়ারা গাছটার তলায়এসে দাঁড়াল।

পিসিমা বললেন—দুধের ঘটিটা রান্নাঘর থেকে বের করে নিয়ে আয় দিকি, এনেদুধটা ঢেলে দে—

কিশোরী চঞ্চল লঘুপদে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল এবং দুধ ঢেলে যথাস্থানে রেখেএসে আমতলায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে—শোন ও পিসি, কাল কি হয়েছে জানো?—হি-হি—

পিসিমা বললেন—কি?

এই কথার উত্তরে আমতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাত-পা নেড়ে একটা গল্প জুড়ে দিলে—কাল দুপুরে নাপিত-বাড়িতে ছাগল ঢুকে, নাপিত-বৌ কাঁথা পেতেছিল, সেকাঁথা চিবিয়ে খেয়েছে, এই মাত্র ঘটনাংশ গল্পের। কিন্তু কি সে বলবার ভঙ্গি, কি সে কৌতুকপূর্ণ কলহাসির উচ্ছ্বাস, কি সে হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি, পিসিমার চায়ের জল গরম হল, চা ভিজোনো হল, হালুয়া তৈরি হ'ল, পেয়ালায় ঢালা হল—তবুও সে গল্পেরবিরাম নেই।

পিসিমা বললেন—ও কুমী মা, একটু ক্ষান্ত দাও, সকালবেলা আমার অনেক কাজকর্মআছে—তোমার গল্প শনতে গেলে সারা দুপুরটি যাবে—এই চা-টা আর খাবারটুকু তোর এক দাদা—ওই বড়ঘরের দাওয়ায় বসে আছে—দিয়ে আয় দিকি।

কুমী বিস্ময়ের সুরে বললে—কে পিসি?

—তুই চিনিস্ নে, আমার বড় জেঠতুতো ভায়ের ছেলে— কাল রাত্তিরে এসেছে—তবে চা তৈরি করবার আর এত তাড়া দিচ্ছি কি জন্যে? তুই কি কারো কথা শনতেপাস্, নিজের কথা নিয়েই বে-হাতি—

কুমী সলাজমুখে চা ও খাবার দাওয়ার ধারে রেখে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হীরেন তাকে অত সহজে যেতে দিতে প্রস্তুত নয়। সে কুমীর নাপিত-বাড়িতে ছাগলের কাঁথাচিবোনোর গল্প শনেচে এবং মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত হয়েছে এইটুকু মেয়ের ক্ষমতায়।

সে বললে—খুকী তোমার নাম কি?

—কুমুদিনী—

হীরেন বললে—এই গাঁয়েই বাড়ি তোমার বুঝি?

ও-পাড়ায়?তা ছাগলের কথা কিবলছিলে? বেশ বলতে পার—

কুমী লজ্জায় ছুটে পালাল।

কিন্তু কুমুদিনীকে আবার কি কাজে আসতে হল। হীরেনের সঙ্গে একটু একটু করেপরিচয় হয়ে গেল। দুজন দুজনের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ। দুজনেই ভাবে এমনশ্রোতা কখনো দেখিনি। তিন দিন পরে দেখা গেল পিসিমার দাওয়ার সামনে উঠোনেদাঁড়িয়ে কুমী এবং দাওয়ার খুঁটি হেলান দিয়ে বসে হীরেন ঘণ্টাঘানেক ধরে পরস্পরেরকথা শনচে, হীরেন অনর্গল বকে যাচ্ছে, কুমী শনচে—আর কুমী যখন অনর্গল বকচেতখন হীরেন মন দিয়ে শনচে।

সেবার পাঁচ ছ'দিন পিসিমার বাড়ি থেকে হীরেন চলে এল।

কুমী যাবার সময়ে দেখা করলে না বলে হীরেন খুব দুঃখিত হল, কিন্তু হীরেন চলেযাবার পরে কুমী দু-তিন দিন মনমরা হয়ে রইল, মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

বুড়ী পিসিমার প্রতি হীরেনের টানটা যেন হঠাৎ বড় বেড়ে উঠল; যে হীরেন দু'বছরতিন বছরেও অনেক চিঠিপত্র লেখা সত্ত্বেও এদিকে বড় একটা মাড়াতো না, সে ঘনঘন পিসিমাকে দেখতে আসতে শুরু করলে।

আজ বছর দুই আগের কথা, হীরেনকে পিসিমা বলেছিলেন—হীরু বাবা, যদি এলিতবে আমার একটা উপকার করে যা। আমার তো কেউ দেখবার লোক নেই তোরা ছাড়া। নরসুপুরে ধরণী কামারের কাছে একগাদা টাকা পাব জমার খাজনার দরুন। একবার গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে টাকাটার একটা ব্যবস্থা করে আয় না বাবা?

হীরেন এসেচে দু'দিন পিসিমার বাড়ি বেড়িয়ে আম খেয়ে ফুটি করতে। সে জ্যষ্টিমাসের দুপুর রোদে খাজনার তাগাদা করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে আসেনি। কাজেই নানাঅজুহাত দেখিয়ে সে পরদিন সকালেই সরে পড়েছিল। এখন সেই হীরেন স্বতঃপ্রবৃত্তিহয়ে একদিন বললে—পিসিমা, তোমার সেই নরসুপুরের প্রজার বাকি খাজনার কিছুহয়েচে? যদি না হয়ে থাকে, তবে এই সময় না হয় একবার নিজেই যাই। এখন আমার হাতে তেমন কাজকর্ম নেই, তাই ভাবছি তোমার কাজটা করেই দিয়ে যাই।—

ভাইপোর সুমতি হচ্ছে দেখে পিসিমা খুব খুশি।

হীরেন সকালে উঠে নরসুপুরে যায়, দুপুরের আগেই ফিরে এসে সেই যে বাড়ি ঢোকে, আর সারাদিন বাড়ি থেকে বার হয় না। কুমীকেও প্রায়ই দেখা যায় পিসিমার উঠোনে, নয় তো আমতলায়, নয়তো দাওয়ার পইঠাতে বসে হীরুদার সঙ্গে গল্পকরতে। কাক-চিল পাড়ায় আর বসে না।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

কুমী বললে—চললুম হীরুদা।

—এখনই যাবি কেন, বোস আর একটু—

উঠানের একটা ধারে একটা নালা। হঠাৎ কুমী বললে—জ্যোৎস্না রাতে এলো চুলে লাফিয়ে নালা পার হলে ভূতে পায়—আমায় ভূতে পাবে দেখবে দাদা—হি-হি-হি-হি—; তারপর সে লাফালাফি করে নালাটা বারকতক এপার-ওপার করচে, এমন সময় ওর মা ডাক দিলেন—ও পোড়ামুখী মেয়ে, এই ভরা সন্কেবেলা তুমি ও করচ কি? তোমায় নিয়ে আমি যে কি করি? ধিঙ্গি মেয়ে, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে! —হীরু ভালো মানুষের মতো মুখখানি করে হারিকেন লণ্ঠনটা মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মায়ের পিছু পিছু কুমী চলে গেল, একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গেল, মুখে তারঅপ্রতিভের হাসি। হীরেন মনমরা ভাবে লণ্ঠনের সামনে কি একখানা বই খুলে পড়তেবসবার চেষ্টা করল।

মাসের পর মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল। নতুন বছরের প্রথমে হীরেনের চাকুরিটাগেল, আপিসের অবস্থা ভালো নয় বলে। এই এক বছরের মধ্যে হীরেন পিসিমার বাড়িআরও অন্তত দশবার এল গেল এবং এই এক বছরের মধ্যে হীরেন বুঝেচে কুমীরমতো মেয়ে জগতে আর কোথাও নেই—বিধাতা একজন মাত্র কুমীকে সৃষ্টি করেচেন। কি বুদ্ধি, কি রূপ, কি কথাবার্তা বলবার ক্ষমতা, কি হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, কি লঘুগতি চরণছন্দ।

প্রস্তাবটা কে উঠিয়েছিল জানি নে, বোধ হয় হীরু পিসিমাই। কিন্তু কুমুদিনীর জ্যাঠামশাই সে প্রস্তাবে রাজী হননি—কারণ তাঁরা কুলীন, হীরেনরা বংশজ। কুলীন হয়ে বংশজের হাতে মেয়ে দেবেন তিনি, একথা ধারণা করাই তো অন্যায।

হীরু শুনে চটে গিয়ে পিসিমাকে বললে— কে তোমাকে বলেছিল পিসিমা ডেকে অপমান ঘরে আনতে? আমি তোমার পায়ে ধরে সেধেছিলুম কুমীর সঙ্গে আমার বিয়েদাও? সবাই জানে আমি বিয়ে করব না, আমি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঢুকব। সব ঠিকঠাকহয়ে গিয়েচে, এবার এই ইয়েটা মিটে গেলেই—

কুমীর কানে কথাটা গেল যে হীরু এই সব বলেচে। সে বললে— হীরুদাকে বিয়ে করতে আমি পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিলাম যে! বয়ে গেল— সন্ন্যাসী হবে তো আমার কি?

হীরু তল্লী বেঁধে পরদিনই পিসিমার বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি চলে গেল।

হীরুর বাড়ির অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়। এবার তার কাকা আর মা একসঙ্গেবলতে শুরু করলেন—সে যেন একটা চাকুরির সন্ধান দেখে। বেকার অবস্থায় বাড়ি বসে কতদিন আর এভাবে চলবে?

হীরুর কাকার এক বন্ধু জামালপুরে রেলওয়ে কারখানার বড়বাবু, কাকার পত্র নিয়ে হীরু সেখানে গেল এবং মাস দুই তাঁর বাসায় বসে বসে খাওয়ার পরে কারখানার আপিসে ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকুরি পেয়ে গেল।

লাল টালি-ছাওয়া ছোট্ট কোয়ার্টারটি হীরুর। বেশ ঘর-দোর, বড় বড় জানালা। জানালা দিয়ে মারক পাহাড় দেখা যায়; কাজকর্মের অবসরে জানালা দিয়ে চাইলেইচোখে পড়ে টানেল দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন যাচ্ছে আসচে। শান্তিং এঞ্জিনগুলোঝকঝক শব্দ করে পাহাড়ের নিচে সাইডিং লাইনের মুড়োয় গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।কয়লার ধোঁয়ায় দিনরাত আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন।

একদিন রবিবারে ছুটির ফাঁকে—সে আর তার কাকার বন্ধু সেই বড়বাবুর ছেলে মণি, মারক পাহাড়ের ধারে বেড়াতে গেল। মণি ছেলোট্ট বেশ, পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে বি. এস-সি. দিয়েচে এবার, তার বাবার ইচ্ছে কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে তাকেইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো। কিন্তু মণির তা ইচ্ছে নয়, সে কলকাতার সায়েন্স কলেজেঅধ্যাপক রমণের কাছে ফিজিক্স পড়তে চায়। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার মনান্তরচলচে। হীরু জানতো এসব কথা।

বৈকাল বেলাটি। জামালপুর টাউনের আওয়াজ ও ধোঁয়ার হাত থেকে অব্যাহতিপাবার জন্যে ওরা দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা চলে গিয়েচে। নীল অতসী ও বনতুলসীর জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় সেই জায়গাটায়। ঘন ছায়া নেমে আসচে পূর্বদিকে শৈলসানুতে, একটি বন্যলতায় হলদে ক্যামেলিয়া ফুলের মতো ফুল ফুটেচে, খুব নিচে কুলিমেয়েরা পাহাড়তলীর লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আঁটি বাঁধচে—পুবদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল মাঠ, ভুট্টার ক্ষেত, খোলার বস্তি, কেবল দক্ষিণে, পুব-পশ্চিমে টানা পাহাড়শ্রেণী ও শালবন থৈ থৈ করচে, আর সকলের ওপরে উপুড় হয়ে পড়েচে—নিকট থেকে দূরে সুদূরে প্রসারিত মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ।

একটা মছয়াগাছের তলায় বসে মণি বাড়ি থেকে আনা স্যান্ডউইচ, ডিমসিদ্ধ, রুটিএবং জামালপুর বাজার থেকে কেনা জিলাপী একখানা খবরের কাগজের ওপরসাজালে—থার্মোফ্ল্যাস্ক খুলে চা বার করে একটা কলাই-করা পেয়ালায় ঢেলে বললে এসো হীরুদা—

দেখলে, হীরু অন্যমনস্ক ভাবে মছয়াগাছের গুঁড়িটা ঠেস্ দিয়ে সামনের দিকে চেয়েবসে আছে।

—খাবে এসো, কি হল তোমার হীরুদা?

হীরু নিরুৎসাহ ভাবে খেতে লাগল। সারা বৈকালটি যতক্ষণ পাহাড়ের ওপর ছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাস—কি যেন একটা ভাবচে। মণি ভাবলে, পাহাড়ে বেড়ানোটাই মাটি হয়ে গেল হীরুদার জন্যে। পাহাড় থেকে নামবার পথে হীরু হঠাৎ বললে—মণি, একটি মেয়েকে বিয়ে করবে ভাই?

মণি হো হো করে হেসে উঠে বললে, কি ব্যাপার বল তো হীরুদা? তোমার আজহয়েচে কি?

—কিছু হয়নি, বলো না মণি? একটি গরিবের মেয়েকে বিয়ে করে দায় উদ্ধারকরো না—তোমার মতো ছেলের—

—কি, তোমার কোনো আপনার লোক? তোমার নিজের বোন নাকি?

—বোন না হলেও বোনের মতই। বেশ দেখতে মেয়েটি, সুশ্রী, বুদ্ধিমতী।

—আমার কথায় তো কিছু হবে না, তুমি বাবাকে কি মাকে বলো। একে তোলেখাপড়া নিয়েই বাবাকে চটিয়ে রেখেচি, আবার বিয়ে নিয়ে চটালে বাড়ি থেকে বেরিয়েযেতে হবে। বাবার মেজাজ বোঝ তো?

রাত্রে নিজের ছোট বাসাটিতে হীরু কথাটা আবার ভাবলে। আজ পাহাড়ের ওপরউঠেই তার কেমন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কুমীর কথা তাহলে তো সে মোটেইভোলে নি! নীল আকাশ, নির্জনতা, ফুটন্ত বন্য ক্যামেলিয়া ফুল, বনতুলসীর গন্ধ—সবসুদ্ধ মিলে একটা বেদনার মতো তার মনে এনে দিয়েছে কুমীর হাসিভরা ডাগর চোখদুটির স্মৃতি, তার হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, তার অনর্গল বকুনি—সে তো সন্ন্যাসী হয়ে যাবে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবাই জানে, মিথ্যেই পিসিমা কুমীর বাবাকে বিয়ের কথাগিয়েছিলেন বলতে। কিন্তু কুমীকে জীবনে সুখী করে দিয়ে যেতে হবে। এ তার একটাকর্তব্য।

সাহসে ভর করে মণির বাপের কাছে সে প্রস্তাবটা করলে। হীরুকে মণির বাপ-মাম্মেহ করতেন; তাঁরা বললেন—মেয়ে যদি ভালো হয় তাদের কোনো আপত্তি নেই। তাঁরা চাকরি উপলক্ষ্যে পশ্চিমে থাকেন, এ অবস্থায় স্বঘরের মেয়ের সন্ধান পাওয়াওকঠিন বটে। যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ভালো মেয়ের—আর মণির বিয়ে যখনদিতেই হবে, তখন মেয়েটিকে দেখে আসতে দোষ কি?

ও কুমীর জ্যাঠাকে আগেই চিঠি লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সমস্ত জিনিসটাকেঅবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অত বড় লোকের ছেলেকে জামাই করার মতোদুরাশা তাঁদের নেই। হীরুর যেমন কাণ্ড!

কিন্তু হীরু পুজোর ছুটিতে সত্যিই মণির এক জাঠভুতো দাদাকে মেয়ে দেখাতেনিয়ে এল।

কুমী এসে হীরুর পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করলে।

হীরু বললে—ভালো আছি স্ কুমী?

—এতদিন কোথায় ছিলে হীরুদা?

—চাকরি করছি যে পশ্চিমে জামালপুরে। সাত-আট মাস পরে তো দেশে ফিরছি।

—ও কাকে সঙ্গে করে এনেচ?

হীরু কেশে গলা পরিষ্কার করে বললে—ও, আমার এক বন্ধুর দাদা—

—তা এখানে এসেচে কেন?

—এসেচে গিয়ে ইয়ে—এমনি বেড়াতে এসেচেই ধরো—তবে ইয়ে—

—তোমার আর টোঁক গিলতে হবে না। আমি সব জানি, কেন ওসব চেষ্টা করছহীরুদা?

হীরু বললে—যাও—অমন করে না ছিঃ, চুলটুল বেঁধে দিতে বল গিয়ে। ওঁরা খুবভালো লোক, আর বড় লোক। জামালপুরে ওঁদের খাতির কি! আমি অনেক কষ্টেওঁদের ওখানে এনেছি। বড় ভালো হবে এ বিয়ে যদি ভগবানের ইচ্ছেয় হয়—

অনেক কষ্টে কুমীকে রাজী করিয়ে তার চুল বাঁধা হল, মেয়ে দেখানোও হল। দেখানোর সময় মেয়ের অজস্র গুণ ব্যাখ্যা করে গেল হীরু। কুমী কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশকোন্ দিকে বলতে পারলে না, তাজমহল কে তৈরি করেছিল সে সম্বন্ধেও দেখা গেলযে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাতের লেখা বেঁকে গেল। গান গাইতে জানে না বললে—যদিও সেভালোই গাইতে জানে এবং তার গলার সুরও বেশ ভালো।

সঙ্গের ভদ্রলোকটি মেয়ে দেখা শেষ করেই ফিরতি নৌকোতে রেল স্টেশনে চলেগেলেন। রাত্রে ট্রেনেই তিনি খুলনায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি যাবেন। যাবার সময়ে বলেগেলেন—মতামত চিঠিতে জানাবেন। হীরু তাঁকে নৌকোতে তুলে দিয়ে ফিরে এসেকুমীকে বললে—কি করে বললে—গান গাইতে জানো না? ছিঃ, একি ছেলেমানুষি, ওরা শহরের মানুষ, গান শুনলে খুব খুশি হয়ে যেত। এমনি তো ঘরের কোণে খুবগান বেরোয় গলায়? আর এর বেলা—

কুমী রাগ করে বললে—ঘরের কোণে গান গাইব না তো কি আসরে বসে গাইতে যাব? পারব না যার তার সামনে গান গাইতে।

হীরুও রেগে বললে—তবে থাকো চিরকাল আইবুড়ো খিঙ্গি হয়ে। আমার কি? কুমীর বাড়ির ও পাড়ার সবাই এজন্য কুমীকে ভর্ৎসনা করলে। গান গাও না গাও, গানগাইতে জানি একথা বলায় দোষ ছিল কি? ছিঃ, কাজটা ভালো হয়নি।

বলা বাহুল্য, ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন পত্র এল না এবং হীরু পূজার ছুটি অন্তেজামালপুরে গিয়ে শুনলে, মেয়ে তাঁদের পছন্দ হয়নি।

মাস পাঁচ ছয় কেটে গেল। কি অদ্ভুত পাঁচ-ছ’ মাস! কাজ করতে করতে জানালাদিয়ে যখনই উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে চায়, তখনই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কুমীকেকতবার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচে— হাত-পা নেড়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমী গল্প করেছে...নিমফুলের গন্ধভরা কত অলস চৈত্র-দুপুরের স্মৃতিতেমধুর হয়ে উঠেচে বর্তমান কর্মব্যস্ত দিনগুলি....

ইতিমধ্যে এক ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে তার খুব আলাপ হয়ে গেল। নতুন এম্-বি.পাস করে জামালপুরে প্রাক্টিস করতে এসেচে, বেশ সুন্দর চেহারা, বাড়ির অবস্থাও খুব ভালো, তার জ্যাঠামশাই এখানে বড় চাকরি করেন। কথায় কথায় হীরু জানতেপারলে ছোকরা এখনও বিয়ে করেনি এবং কুমীদের পালটি ঘর। অনেক বুঝিয়ে সেতার জ্যাঠামশাইকে মেয়ে দেখতে যেতে রাজী করালে। মেয়ে দেখাও হল—কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই হল না, তাঁদের কুটুম্ব পছন্দ হয়নি শোনা গেল। একে তো অজ পাড়াগাঁ, দ্বিতীয়ত তাঁরা ভেবেছিলেন পাড়াগাঁয়ের জমিদার কিংবা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, অমনগরিব ঘরের মেয়ে তাঁদের চলবে না।

মাস তিনেক পরে হীরু আর এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গিয়ে পিসিমার বাড়ি হাজিরহল। কুমীদের বাড়ির সবাই বললে— হীরু বড় ভালো ছেলে, কুমীর জন্য চেষ্টা করছেপ্রাণপণে। কিন্তু অত বড় বড় সম্বন্ধ এনে ও ভুল করচে, ওসব কি জোটে আমাদের কপালে? মেয়ে পছন্দ হলেই বা অত টাকা দিতে পারবোকোথেকে?

কুমীর সঙ্গে খিড়কী দোরের কাছে হীরুর দেখা। কুমী বললে—হীরুদা, তুমি কেনএসব পাগলামিকরচ বল তো? বিয়ে আমি করব না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমিওসব বন্ধ কর।

হীরু বলল—ছিঃ লক্ষ্মী দিদি, অমন করে না, এবার যে জায়গায় ঠিক করচি, তাঁরাখুব ভালো লোক, এবার নির্ঘাত লেগে যাবে—

কুমী লজ্জায় রাঙা হয়ে বলল—তুমি কি বল তো হীরুদা। আমার রাত্রে ঘুম হচ্ছেনা, লাগবে কি না লাগবে তাই ভেবে। মিছিমিছি আমার জন্য তোমাকে লোকে যা তা বলে—তা জানো? তুমি ক্ষান্ত দাও, তোমার পায়ে পড়ি হীরুদা—

হীরু এসব কথা কানে তুললে না। পাত্রপক্ষের লোক নিয়ে এসে হাজির করলে, কিন্তু কুমী কিছুতেই এবার তাদের সামনে আসতে রাজী হল না। সে দস্তুরমতো বেঁকেবসলো।

হীরু বাড়ির মধ্যে গিয়ে বললে—পিসিমা, আপনারা দেরি করছেন কেন?

কুমীর মা বললেন—এসে বোঝাও না মেয়েকে বাবা! আমরা তো হার মেনে গেলাম। ও চুলে চিরকনি ছোঁয়াতে দেবে না, উঠবেও না, বিছানায় পড়েই রয়েছে।

কুমী ঘর থেকে বললে—পড়ে থাকব না তো কি? বারে বারে সং সাজতে পারবো না আমি, কারো খাতিরেই না। হীরুদাকে বল না—সং সেজে বেরুক ওদের সামনে।

হীরু ঘরের মধ্যে ঢুকে কড়া সুরে বললে কুমী ওঠ, কথা শোন্—যা চুল বাঁধগেয়া—

—আমি যাব না—

—যাবি নে, চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাব—ওঠ—দিন দিন ইয়ে হচ্ছেন— না? ওঠ বলচি—

কুমী দ্বিরুক্তি না করে বিছানা ছেড়ে দালানে চুল বাঁধতে বসে গেল, সাজানোগোজানোগ বাদ গেল না, মেয়ে দেখানোও হল, কিন্তু ফল সমানই দাঁড়ালো অর্থাৎ পাত্রপক্ষ বাড়ি গিয়ে চিঠি দেবো বলে গেলেন।

জামালপুরের কাজে এসে যোগ দিলে হীরু। কিন্তু সে যেন সর্বদাই অন্যমনস্ক। কুমীর জন্যে এত চেষ্টা করেও কিছু দাঁড়ালো না শেষ পর্যন্ত! কি করা যায়? এদিকে কুমীদের বাড়িতেও তার পসার নষ্ট হয়েছে, তার আনা সম্বন্ধের ওপর সবাই আস্থা হারিয়েছে। হারাবারই কথা। এবার সেখানেও কথা তুলবার মুখ নেই তার। অত বড় বড় সম্বন্ধ নিয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভুল হয়েছে। কুমীর ভালো ঘর জুটিয়ে দেবার ব্যাকুল আগ্রহে সে ভুলে গিয়েছিল যে, বড়তে-ছোটতে কখনো খাপ খায় না।

লজ্জায় সে পিসিমার বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিল।

বছর দুই তিন কেটে গেল।

হীরু চাকুরিতে খুব উন্নতি করে ফেলেচে তার সুন্দর চরিত্রের গুণে। চিফ ইঞ্জিনিয়ারের আপিসে বদলি হল দেড়শো টাকায় মার্চ মাস থেকে।

হীরু আর সেই হীরু নেই। এমনি হয়, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রতি দিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর, তিলে তিলে মানুষের দেহের ও মনের পরিবর্তন হচ্ছে— অবশেষে পরিবর্তন এমন গুরুতর হয়ে ওঠে যে, বহুকাল পরে আবার সাক্ষাৎ হলেআগের মানুষটিকে আর চেনাই যায় না। হীরু ধীরে ধীরে বদলেচে। অল্প অল্প করে সেকুমীকে ভুলেচে। রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাবার বাসনাও তার নেই বর্তমানে। এর মূলেএকটা কারণ আছে, সেটা এখানে বলি। জামালপুরে একজন বয়লার-ইন্স্পেক্টরছিলেন, তাঁর বাড়ি হুগলী জেলায়, রুড়কীর পাস ইঞ্জিনিয়ার, বেশ মোটা মাইনে পেতেন। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তাঁর ছটি মেয়ের বিয়ে দিতে তাকে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। এখনওএকটি মেয়ে বাকি।

হীরুর সঙ্গে এই পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। সুরমা হীরুর সামনে বারহয়, তাকে দাদা বলে ডাকে, কখনও কখনও নিজের আঁকা ছবি দেখায়, গল্প করে, গানশোনায়।

একদিন হঠাৎ হীরুর মনে হল—সুরমার মুখখানা কি সুন্দর! আর চোখ দুটি—পরেই ভাবল—ছিঃ, এসব কি ভাবচি? ও ভাবতে নেই।

আর একদিন অমনি হঠাৎ মনে হলো—কুমীর চেয়ে সুরমা দেখতে ভালো—কি গায়ের রং সুরমার! তখনই নিজের এ চিন্তায় ভীত ও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। না, কিভাবনা এসব, মন থেকে এসব জোর করে তাড়াতে হবে। কিন্তু জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ হলে আজ গেরুয়াখারী স্বামীজীদের ভিড়ে পৃথিবীটা ভর্তি হয়ে যেত—হীরুর বয়েস কম, মন এখনও মরেনি, শুষ্ক, শীর্ণ, এক অতীত মনোভাবের কঙ্কালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে তার নবীন ও সতেজ মন ঘোর আপত্তি জানালে। কুমীর সঙ্গে যা কিছু ছিল, সে অমূল তরু শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গিয়েছে আলো-বাতাস ও পৃথিবীরস্পর্শ না পেয়ে।

সুরমাকে বিয়ে করার কিছুদিন পরে সুরমার বাবা বয়লার ফাটার দুর্ঘটনায় মারাগেলেন; রেল কোম্পানী হীরুর শাশুড়িকে বেশ মোটা টাকা দিলে এজন্যে; প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও যা পাওয়া গেল তাতে মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করেও হাতে ছ'সাত হাজার টাকা রইল। সুরমার মা ও একটি নাবালক ভাইয়ের দেখাশোনার ভার পড়েছিলহীরুর উপর, কাজেই টাকাটা সব এসে পড়লো হীরুর হাতে। হীরু সে টাকায় কয়লারব্যবসা আরম্ভ করল। চাকরি প্রথমে ছাড়েনি, কিন্তু শেষে রেল কারখানায় কয়লারকন্ট্রোল নিয়ে একবার বেশ মোটা কিছু লাভ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসাতে ভালোভাবেই নামল। সুরমাকে বিয়ে করার চার বছরের মধ্যে হীরু একজন বড় কন্ট্রোলার হয়ে পড়ল। শাশুড়ির টাকা বাদ দিয়েও নিজের লাভের অংশ থেকে সে তখন ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা কারবারে ফেলেচে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে হীরুর চালচলন বদলে গিয়েচে। রেলের কোয়ার্টার ছেড়েদিয়ে মুগ্ধেরে গঙ্গার ধারে বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানেই সকলকে রেখেচে। রেলোজামালপুরে যাতায়াত করে রোজ, মোটর এখনও

করেনি—তবে বলতে শুরু করেচেমোটর না রাখলে আর চলে না; ব্যবসা রাখতে গেলে ওটা নিতান্তই দরকার, বাবুগিরিরজন্যে নয়। হঠাৎ এই সময় দেশ থেকে পিসিমার চিঠি এল, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না; বহুকাল হীরুকে দেখেননি তিনি, তাঁর বড় ইচ্ছে মুঙ্গেরে হীরুর কাছে কিছুদিন থাকেন ও দুবেলা গঙ্গাস্নান করেন।

সুরমা বললে—আসতে যখন চাইচেন, নিয়ে এস গে—আমিও তাঁকে কখনওদেখিনি—আমরা ছাড়া আর তাঁর আছেই বা কে? বুড়ো হয়েচেন যে ক’দিন বাঁচেনএখানেই গঙ্গাতীরে থাকুন।

বাসায় আর এমন কেউ ছিল না, যাকে পাঠানো যায় পিসিমাকে আনতে, কাজেইহীরুই দেশে রওনা হল।

ভাদ্রমাস। দেশ এবার ভেসে গিয়েচে অতিবৃষ্টিতে। কোদলা নদীতে নৌকায় করে আসবার সময় দেখলে জল উঠে দুপাশের আউশ ধানের ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়েচে। গোয়ালবাসির বিলে জল এত বেড়েচে যে, নৌকোর বুড়ো মাঝি বললে, সে তার জ্ঞানে কখনও এমন দেখেনি, গোয়ালবাসি ও চিত্রাঙ্গপুর গ্রাম দু’খানা প্রায় ডুবে আছে।

অথচ এখন আকাশে মেঘ নেই, শরতের সুনীল আকাশের নিচে রৌদ্রভরা মাঠ, জল বাড়বার দরুন নৌকো চললো মাঠের মধ্য দিয়ে, বড় বাবলা বনের পাশ কাটিয়ে। ঘন সবুজ দীর্ঘ লতানে বেতঝোপ কড়কড় করে নৌকোর ছইয়ের গায়ে লাগচে, মাঠেরমাঝে বন্যার জলের মধ্যে জেগে আছে ছোট ছোট ঘাস, তাতে ঘন ঝোপ।

পিসিমাদের গ্রামে নৌকো ভিড়তে দুপুর ঘুরে গেল। এখানে নদীর পাড় খুব উঁচুবেলে কূল ছাপিয়ে জল ওঠেনি; দু-পাড়েই বন, একদিকে হ্রস্ব ছায়া পড়েচে জলে, অন্যপাড়ে খররৌদ্র। এই বনের গন্ধ...নদীজলের ছলছল শব্দ...বাঁশবনে সোনার সড়কীরমতো নতুন বাঁশের কোঁড় বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে...এই শরৎ দুপুরের ছায়া...এই সব অতি পরিচিত দৃশ্য একটিমাত্র মুখ মনে করিয়ে দেয়...অনেকদিন আগের মুখ... হয়তো একটু অস্পষ্ট হয়েগিয়েচে, তবুও সেই মুখ ছাড়া আর কোনো মুখ মনে আসে না। নদীর ঘাটে নেমে, পথে চলতে চলতে সে মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলমনের মধ্যে...এক ধরনের হাত-নাড়ার ভঙ্গি আর কি বকুনি, অজস্র বকুনি!...জগতেআর কেউ তেমন কথা বলতে পারে না। অনেক দূরের কোন্ অবাস্তব শূন্যে ঘুরচেসুরমা, তার আকর্ষণের বাইরে এ রাজ্য। এখানে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী আর একজন, তারএকচ্ছত্র অধিকার এখানে—সুরমা কে? এখানকার বন, নদী, মাঠ, পাখি সুরমাকে চেনেনা।

হীরু নিজেই অবাক হয়ে গেল নিজের মনের ভাবে।

পিসিমা যথারীতি কান্নাকাটি করলেন অনেকদিন পরে ওকে দেখে। আরও ঢের বেশি বুড়ী হয়ে গিয়েছেন, তবে এখনও অথর্ব হননি। বেশ চলতে ফিরতে পারেন। হীরুর জন্যে ভাত চড়াতে যাচ্ছিলেন, হীরু বললে—তোমায় কষ্ট করতে হবে না পিসিমা, আমি চিঁড়ে খাব। ওবেলা বরং রুঁধো।

অনেকবার বলি-বলি করেও কুমীর কথাটা সে কিছুতেই পিসিমাকে জিগ্যেস করতে পারলে না। একটু বিশ্রাম করে বেলা পড়লে সে হাটতলার মধু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় গিয়ে বসল। মধু ডাক্তারের চুল-দাড়িতে পাক ধরেচে, একটি ছেলে সম্প্রতি মারা গিয়েচে— সেই গল্প করতে লাগল। গ্রামের মজবের সেই বুড়ো মৌলবী এখনও আছে; এখনও সেই রকম নিজের অক্ষশাস্ত্রে পারদর্শিতার প্রসঙ্গে সাব-ইনস্পেক্টর মহিমবাবুর গল্প করে। মহিমবাবু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ অঞ্চলে স্কুলসাব-ইনস্পেক্টারি করতেন। এখন বোধ হয় মরে ভূত হয়ে গিয়েচেন। কিন্তু কোন্‌বারমজব পরিদর্শন করতে এসে নিজেই শুভঙ্করীর সারাকালির একটা অঙ্ক দিয়ে নিজেই কষে বুঝিয়ে দিতে পারেননি, সে গল্প আজও এদেশে প্রচলিত আছে। এই মৌলবী সাহেবের মুখেই হীরু এ গল্প বহুবার শুনেচে।

সন্ধ্যা হবার পূর্বেই হীরু হাটতলা থেকে উঠল। মধু ডাক্তার বললে—বসো হেহীরু, সন্ধ্যটা জ্বালি—তারপর দু-একহাত খেলা যাক। এখন না হয় বড়ই হয়েচ, পুরোনো দিনের কথা একেবারে ভুলে গেলে যে হে!

হীরু পথশ্রমের অজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়ল। তার শরীর ভাল নয়, পুরোনোদিনের এই সব আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়ে সে ভালো করেনি।

কুমী এখানে আছে কিনা, এ কথাটা মধু ডাক্তারকেও সে জিগ্যেস করবে ভেবেছিল। ওদের একই পাড়ায় বাড়ি। কুমী মধু ডাক্তারকে কাকা বলে ডাকে।

কুমীদের সম্বন্ধে মাত্র সে এইটুকু শুনেছিল যে, কুমীর জ্যাঠামশাই বছর পাঁচেক হোল মারা গিয়েছেন এবং জ্যাঠাতুতো ভাইয়েরা ওদের পৃথক করে দিয়েছে।

অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে সে দেখলে কখন কুমীদের পাড়াতে, একেবারে কুমীদের বাড়ির সামনেই এসে পড়েছে। সেই জিউলি গাছটা, এই গাছটাতে একবারসাপ উঠে পাখির ছানা খাচ্ছিল, কুমী তাকে ছুটে গিয়ে খবর দিতে, সে এসে সাপতাড়িয়ে দেবার জন্য ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এ পাড়ার গাছে-পালায়, ঘাসে-পাতায়, সন্ধ্যার ছায়ায়, শাঁখের ডাকে কুমী মাখানো। এই রকম সন্ধ্যায় কুমীদের বাড়ি বসে সে কত গল্প করেছে কুমীর সঙ্গে।

চুপ করে সে জিউলিতলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল।...

তার সামনের পথটা দিয়ে তেইশ চক্কিশ বছরের একটি মেয়ে দুটো গরুর দড়ি ধরেনিয়ে আসছে। কুমীদের বাড়ির কাছে বাঁশতলাটায় যখন এল, তখন হীরু চিনতে পারলেসে কুমী।

প্রথমটা সে যেন অবাক হয়ে গেল...আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল। সত্যিই কুমী? এমন অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে তার চোখের সামনে! কুমীই বটে, কিন্তু কত বড়হয়ে গিয়েছে সে!

হঠাৎ হীরু এগিয়ে গিয়ে বললে, কুমী কেমন আছ? চিনতে পারো?

কুমী চমকে উঠল, অন্ধকারে বোধ হয় ভাল করে চিনতে পারলে না, লোকটা কে?

—আমি হীরু।

কুমী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বার হল না। তারপরএসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে হীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কবে এলেহীরুদা? কোথায় ছিলে এতকাল? সেই জামালপুরে?

—আজই দুপুরে এসেছি।

আর কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরল না। সে কেবল একদৃষ্টে কুমীরদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমীর কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পরনে একখানা আধময়লা শাড়ি—যে কুমীকে সে দেখে গিয়েছিল ছ-সাত বছর আগে, এ সে কুমী নয়। সে কৌতূহলোচ্ছল কলহাস্যময়ী কিশোরীকে এর মধ্যে চেনা যায় না। এ যেন নিরানন্দের প্রতিমা, মুখশ্রীকিন্তু আগের মতোই সুন্দর। এতদিনেও মুখের চেহারা খুব বেশি বদলায়নি।

কুমী বললে—এসো আমাদের বাড়ি হীরুদা। কত কথা যে তোমার সঙ্গে আছে, এই ক'বছরের কত কথা জমানো রয়েছে, তোমায় বলব বলব করে কতদিন রইলাম, তুমি এ পথে আর এলেই না।

হয়েছে! সেই কুমী! ওর মুখে হাসি সেই পুরোনো দিনের মতই আবার ফুটেউঠেছে; হীরু ভাবলে, আহা, ওর বকুনির শ্রোতা এতদিন পায়নি তাই ওর মুখখানা স্নান।

—তুই আগে চল, কুমী।

—তুমি আগে চল, হীরুদা।

চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলে রোয়াকে বসে মুড়ি খাচ্ছিল। কুমীকে দেখেবললে—ওই মা এসেছে!

—বসো হীরুদা, পিঁড়ি পেতে দিই। মা বাড়ি নেই, ওপাড়ায় গিয়েছে রায়-বাড়ি, কাল ওদের লক্ষ্মীপুজোর রান্না রেঁধে দিতে। আমি ছেলেটাকে মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখে গরুআনতে গিয়েছিলুম দীঘির-পাড় থেকে। উঃ—কতকাল পরে দেখা হীরুদা! বসো, বসো। কি খাবে বলো তো, তুমি মুড়ি আর ছোলাভাজা খেতে ভালোবাসতে।

বসো, সন্দেশটা দেখিয়ে খোলা চড়িয়ে গরম গরম ভেজে দিই। ঘরে ছোলাও আছে, নারকোলও আছে। দাঁড়াও, আগে পিদিমটা জ্বালি।

সেই মাটির ঘর সেই রকমই আছে। সেই কুমী সন্ধ্যা-প্রদীপ দিচ্ছে পুরোনো দিনের মতো, যখন সে কত রাত পর্যন্ত ওদের বাড়ি বসে গল্প করতো। তবুও কত-কতপরিবর্তন হয়ে গিয়েছে! কত ব্যবধান এখন তার আর কুমীর মধ্যে।

কুমী প্রদীপ দেখিয়ে চাল ভাজতে বসল। একটু পরে ওকে খেতে দিয়ে সামনেবসল—সেই পুরোনো দিনের মতই গল্প করতে। সেই হাত-পা নাড়া, সেই বকুনি—সবইসেই। কত কথা বলে গেল। হীরু ওর দিকে চেয়ে থাকে, চোখ আর অন্য দিকে ফেরাতেপারে না। কুমীও তাই।

হীরু বললে—ইয়ে, কোথায় বিয়ে হল কুমী?

কুমী লজ্জায় চোখ নামিয়ে বললে—সামটা।

—তা বেশ।

তারপর কুমী বললে, ক'দিন থাকবে এখন হীরুদা?

—থাকবার জো নেই, কাজ ফেলে এসেছি, পিসিমাকে নিয়ে কালই যাব। পিসিমা চিঠি লিখেছিলেন বলেই তো তাঁকে নিতে এলাম।

—না, না হীরুদা, সে কি হয়? কাল ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপূজো, কাল কোথায় যাবে? থাকো এখন দু'দিন। কতকাল পরে এলে। তুমিও তো বিয়ে করেচ, বৌদিকে নিয়েএলে না কেন? দেখতাম। ছেলেমেয়ে কি?

—দুটি ছেলে একটি মেয়ে।

—বেশ, বেশ। আচ্ছা, আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?

মনে খুব পড়তো না, কিন্তু একথাও ঠিক যে, এখন এমন মনে পড়চে যে সুরমা ও জামালপুর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বড় লোকের মেয়ে সুরমা তার মনের মতোসজিনী নয়, তার সঙ্গে সব দিক থেকে মেলে—খাপ খায় এই কুমীর। অথচ সুরমারজন্য দামী মাদ্রাজী শাড়ি কিনে নিয়ে যেতে হবে কলকাতা থেকে যাবার সময়—সুরমা বলেছে, যাচ্চ যখন দেশে, ফিরবার সময় কলকাতা থেকে পুজোর কাপড়-চোপড় কিনেএনো। এখানে ভালো জিনিস পাওয়া যায় না, দরও বেশি।

আর কুমীর পরনে ছেঁড়া আধময়লা কাপড়।

না— দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে বড়লোকী উপহার দিয়ে সে তার অপমান করবে না।

কুমী বকেই চলেছে। অনেক দিন পরে আজই ও আনন্দ পেয়েছে— নিরানন্দঅসচ্ছল সংসারের একঘেয়ে কর্মের মধ্যে বালিকাবয়সের শত আনন্দের স্মৃতি নিয়েপুরোনো দিনগুলো হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় কেমন করে ফিরেছে।

ঘণ্টা দুই পরে কুমীর মা এলেন। বললেন—এই যে, জুটেচ দুটিতে? আমি শুনলুমদিদির মুখে যে হীরু এসেছে। কাল লক্ষ্মীপূজো, তাই রায়েদের বাড়ি রান্না করে দিয়েএলাম। তা ভালো আছিস বাবা হীরু? কুমী কত তোর কথা বলে। তোর কথা লেগেইআছে ওর মুখে; এই আজও দুপুর বেলা বলছিল, মা, হীরুদা নদীতে বন্যা দেখলে খুশি হোত; এবার তো বন্যা এসেছে, হীরুদা যদি দেখতো, খুব খুশি হোত—না মা? তা, আমি তুই এসেছিষ্ শুনই দিদির ওখানে গিয়েছিলুম। বাড়ি নেই দেখে ভাবলাম সেঠিক আমাদের ওখানে গিয়েছে। তা ব'স বাবা, চট করে পুকুর থেকে কাপড় কেচে গা ধুয়ে আসি। গামছাখানা দে তো কুমী। খোকার জন্য তরকারী এনেচি কাঁসিতে। ওকে ভাত দে। এই এর বিয়ে দিয়েছি সামটায়-বুঝলে বাবা হীরু? জামাই দোকানে

সামান্যমাইনের খাতা-পত্র লেখার কাজ করে। তাতে চলে না। তার ওপর দজ্জাল ভাই-বৌ খেতে পর্যন্ত দেয় না ভালো করে মেয়েটাকে। এই দেখো— এখানে এসেচে আজ পাঁচমাস, নিয়ে যাবার নামটি নেই, বৌদিদির হুকুম হবে তবে বৌ নিয়ে যেতে পারবে। আরএদিকে তো আমার এই অবস্থা, মেয়েটার পরনে নেই কাপড়, জামাই আসে যায়, কাপড়ের কথা বলি, কানেও তোলে না। আমি যে কি করে চালাই? তা সবই অদৃষ্ট নইলে—

কুমী ঝাঁজালো সুরে বললে—আঃ যাও না, গা ধুয়ে এসো না—কি বকবক শুরু করলে—

অদৃষ্ট, হাঁ অদৃষ্টই। সে আজ কোথায়, আর কুমী কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্ছে। পরনেকাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, জীবনে আনন্দ নেই, সাধ-আহ্লাদ নেই, কিছুই দেখলে না, কিছুই ভোগ করলে না, সবই অদৃষ্ট ছাড়া আর কি?

খানিক রাত্রে হীরু উঠল। কুমী প্রদীপ ধরে এগিয়ে দিলে পথ পর্যন্ত। বললে—আমাদের হারিকেন লণ্ঠন নেই, একটা পাকাটি জ্বলে দিই, নিয়ে যাও হীরুদা, বাঁশবনেবড্ড অন্ধকার।

সকালে কুমী পিসিমার বাড়ি এসে ডাক দিলে কি হচ্ছে, ও হীরুদা—

—এই যে কুমী, কামিয়ে নিলাম। এইবার নাইবো।

কুমী ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—কেন, কিসের তাড়া নাইবার এত সকালে? তোমার কিন্তু আজ যাওয়া হবে না হীরুদা—বলে দিচ্ছি। আজ ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীপূজোর অরন্ধন, তোমায় নেমস্তন্ন করতে এলুম আমাদের বাড়ি। মা বললেন—যা গিয়ে বলেআয়।

হীরু আর প্রতিবাদ করতে পারলে না, কুমীর কাছে প্রতিবাদ করে কোনো লাভইনেই সে জানে। কুমী খানিকটা পরে বলল—আমার অনেক কাজ হীরুদা, আমি যাই। তুমি নেয়ে সকালে সকালে এস।

হীরু বেলা দশটার মধ্যে ওদের বাড়ি গেল। আজ আর রান্নার হাঙ্গামা নেই। কুমীবললে—আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে জানো তো? আর কচুর শাক—আর একটা কি জিনিস বলো তো?...উঁহ...তুমি বলতে পারবে না।

কুমীর মা বললেন—কাল রাত্রে তুই চলে গেলে মেয়ে অত রাত্রে তোর জন্যনারকেল কুমড়ো রাঁধতে বসল। বললে, হীরুদা বড় ভালোবাসে মা, কাল সকালে খেতে বলব, রেঁধে রাখি।

কুমী স্নান সেরে এসে একখানা ধোয়া শাড়ি পরেচে, বোধহয় এইখানাই তার একমাত্র ভালো কাপড়। সেই চঞ্চলা মুখরা বালিকা আর সে সত্যই নেই, আজ দিনেরআলোয় কুমীকে দেখে ওর মনে হল—কুমীর চেহারা আরও সুন্দর হয়েছে, তবে ওর মুখে চোখে একটা শান্ত মাতৃভের ভাব ফুটে উঠেচে, যেটা হীরু কখনো ওর মুখে দেখে নি। কুমী অনেক ধীর হয়েছে, অনেক সংযত হয়েছে। মাথায় সেই রকমের এক ঢাল চুল, মুখশ্রী এখনও সেই রকম লাভণ্যময়। তবুও যেন কুমীকে চেনা যায় না, বয়সেরসঙ্গে সঙ্গে বালিকা কুমী অন্তর্হিত হয়েছে, এখন যে কুমীকে সে দেখে তার অনেকখানিই যেন সে চেনে না।

কিন্তু খানিকটা বসবার পরে হীরুর এ ভ্রম ঘুচে গেল। বাইরের চেহারাটা যতই বদলে যাক না কেন, তার সামনে যে কুমী বার হয়ে এল, সে সেই কিশোরী কুমী। ওরযেটুকু পরিচিত তা ওর মধ্যে বার হয়ে এল—যেটুকু হীরুর অপরিচিত, তা নিজেকেগোপন রাখলে।

কি চমৎকার কুমীর মুখের হাসি। হীরুর মোহ নেই, আসক্তি নেই, আছে কেবল একটা সুগভীর স্নেহ, মায়া, অনুকম্পা...এ এক অদ্ভুত মনের ভাব, কুমীকে সে সর্বস্ববিলিয়ে দিতে পারে তাকে একটুকু খুশি করবার জন্য।

কুমী কত কি বকচে বসে বসে...পুরোনো দিনের কথা তুলচে কেবল কেবল।

—মনে আছে হীরুদা, সেই একবার জেলেদের বাঁশতলায় আলেয়া জ্বলেছিল—সেও তো এই ভাদ্রমাসে...সেই চারুপাঠ মনে আছে?

হীরুর খুব মনে আছে। সবাই ভয়ে আড়ষ্ট, আলেয়া নাকি ভূত, যে দেখতে যায়তার অনিষ্ট হয়। হীরু সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল দেখতে, কুমীও পিছু পিছু গিয়েছিল।

হীরু বলেছিল—আসছি কেন পোড়ারমুখী, ভূত ধরে খাবে যে—

কুমী ভেংচি কেটে বলেছিল—ইস! ভূতে ধরে ওঁকে খাবে না—আমাকেই খাবে। আলেয়া বুঝি ভূত? ও তো একরকম বাষ্প, আমি পড়িনি বুঝি চারুপাঠে? শুনবে বলব...অনেকের বিশ্বাস আছে আলেয়া এক প্রকার ভূতযোনি, বাস্তবিক ইহা তা নয়—

হীরু ধমক দিয়ে বলেছিল—রাখ তোর চারুপাঠ—আরম্ভ করে দিলেন এখন অন্ধকারের মধ্যে চারুপাঠ...বলে ভয়ে মরচি—

পরক্ষণেই কুমী খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল—কি বললে হীরুদা, ভয়েমরচো? হি হি—হি হি—এত ভয় তোমার যদি এলে কেন? চারুপাঠ পড়লে ভয়থাকতো না...চারুপাঠ তো আর পড়িনি?

সেই সব পুরোনো গল্প। আলেয়া...আলেয়াই বটে।

কুমীর যে খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে তা বোঝা গেল, যখন ও গ্রামের এক বিধবাগরিব মেয়ের কথা তুললে। আগে এসব কথা কুমী বলত না। এখন সে পরের দুঃখবুঝতে শিখেছে। মুখুয্যে-বাড়ির বড় পুরীপাল্লার মধ্যে হর মুখুয্যের এক বিধবানাতনী—নিতান্ত বালিকা—কি রকম কষ্ট পাচ্ছে, পুকুরঘাটে কুমীর কাছে বসে নির্জনেমৃত স্বামীর রূপগুণের কত গল্প করে—এ কথা কুমী দরদ দিয়ে বলে গেল। সত্যিইমাতৃ ওর মধ্যে জেগেচে, ওকে বদলে দিয়েচে অনেকখানি।

হঠাৎ কুমী বললে—অই দেখো হীরুদা, বকেই যাচ্ছি। তোমায় যে খেতে দেবো, সে কথা মনে নেই।

তার পরে সে উঠে তাড়াতাড়ি হীরুকে ঠাঁই করে দিয়ে ভাত বেড়ে নিয়ে এল। হাসিমুখে বললে—জামালপুরের বাবুর আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে। রুচবে তো মুখে? নেবু কেটে দেবো এখন অনেক ক’রে, নারকোল-কুমড়ি আছে, কচুর শাকআছে।

এসব সত্যিই হীরু অনেকদিন খায়নি। যা যা সে খেতে ভালোবাসে, কুমী তারকিছুই বাদ দেয়নি। হীরু আশ্চর্য হয়ে গেল—এত কাল পরেও কুমী মনে রেখেচে এ সব কথা।

খেতে বসে হীরু বললে—কুমী, ছেলেবেলা ভালো লাগে, না এখন ভালো লাগে?

—এ কথার উত্তর নেই হীরুদা। ছেলেবেলায় তোমরা সব ছিলে, সে এক দিন ছিল। এখনও তা বলে খারাপ লাগে না—জীবনে নানারকম দেখা ভালো—নয় কি?

—কুমী, একটা কথার উত্তর দে। তোর সংসারের টানাটানি খুব?

—কে বললে একথা?মা বলেছিল সেই তো কাল রাত্তিরে?ও বাজে কথা, জানো তো, মা যত বাজে বকে। বুড়ো হয়ে মার আরও জিব আলাগা হয়ে গেছে।

—কুমী, আমার কাছে সত্যি কথা বলবিনে?

—ঐ, তুমিও পাগলামি শুরু করলে। নাও, খেয়ে নাও—যত বাজে বকতেপারো—মা গো! ...দাঁড়াও পায়েসটা আনি—কচুর শাক পড়ে রইল কেন অতখানি? ...না সে হবে না—

—দ্যাখ্ কুমী, আমার কাছে বেশি চালাকি করিস্ নে। তোকে আর আমি জানি নে?কোদলার ঘাটে পায়ে খেজুর-কাঁটা ফুটে গিয়েছিল, মুখে একটু রা করিস্নি, জানতে দিস্নি কাউকে—

—আবার?

হীরু চুপ করে গেল। এতখানি বলে সে ভালো করেনি, ঝাঁকের মাথায় বলেফেলেচে। কুমী যা ঢাকতে চায়, ও তা বার করে কুমীর আত্মসম্মানে ঘা দিতে চায় কেন? ছিঃ—

কুমী বললে—আবার কবে আসবে হীরুদা?

—সত্যি কথা যদি শুনতে চাস, আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না কিন্তু।

—আবার বাজে বকতে শুরু করেচ হীরুদা। তোমার যা কিছু সব সামনে, চোখের আড়াল হলে আর মনে থাকে না। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত বাজে বকুনি—

—তুমি তো জানো না একটুও বাজে বকতে? আমি ইচ্ছে করলে থাকতে পারিনে ভেবেছিস?

—হাঁ, থাকো না দেখি কাজকর্ম বন্ধ করে। বৌদি এসে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে না?

—আচ্ছা সে যাক, একটা কথার উত্তর তোকে দিতেই হবে। আমি যদি এখানে থাকি তুই খুশি হোস?

—উঃ, মা গো, মুখ বুজে খেয়ে নাও দিকি? কি বাজে বকতেই পারো!

হীরু দুঃখিত ভাবে বললে—আমার এ কথাটারও উত্তর দিবি নে কুমী? তুই এত বদলে গিয়েছিস আমি এ ভাবেই পারিনে। আচ্ছা, বেশ।

কুমী হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়তে পড়তে বললে— তোমার কিন্তু একটুও বদলায়নি হীরুদা, সেই রকম ‘আচ্ছা’, বেশ’ বলা, সেই রকম কথায় কথায় রাগ করা। আচ্ছা, কি বলব বলো দিকি? তুমি জানো না ও-কথার কি উত্তর আমি দিতে পারি? ভেবে দ্যাখোতা হলে আমি বদলাইনি, বদলে গিয়েছ তুমি হীরুদা।

—আচ্ছা কুমী, এতটা না বকে সামান্য দু কথায় সাদা উত্তর একটা দে না কেন? বকুনিতে আমি কি তোর সঙ্গে পারব?

—না, তা তুমি পারবে কেন? বকতে তুমি একটুও জানো না। হ্যাঁ, হই।

—মন থেকে বলচিস?

—আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করচে হীরুদা, এতটা বদলে গিয়েচ তুমি? যাও—আমি তোমার কোনো কথার আর উত্তর দেবো না, তুমি না নিজের বুদ্ধির বড়অহঙ্কার করতে?

—কুমী, রাগ করিস নে। অনেক কাজের মধ্যে থেকে আমার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিটা নষ্ট হয়েগিয়েচে। যাক, বাঁচলুম কুমী।

—পায়েসটা খাও, তোমার পায়ে পড়ি। আর বকুনিটা কিছুক্ষণের জন্যে ক্ষান্তরাখো। কিছু তোমার পেটে গেল না এই অনাছিষ্টি বকুনির জন্যে।

কুমী পরদিন এসে বিছানা-বাক্স গুছিয়ে দিলে। ঘাট পর্যন্ত এসে ওদের নৌকোতেউঠিয়ে দিলে। নৌকো ছেড়ে যখন অনেকটা গিয়েচে তখনও কুমী ডাঙায় দাঁড়িয়েআছে।

দু’পাড়ের নদীচড়া নির্জন। দুপুরের রৌদ্র আজ বড় প্রখর, আকাশ অদ্ভুত ধরনেরনীল, মেঘলেশহীন। বন্যার জলে পাড়ের ছোট কালকাসুন্দি গাছের বন পর্যন্ত ডুবেগিয়েচে। কচুরিপানার বেগুনী ফুল চড়ার ধারে আটকে আছে। সেই সব বন-জঙ্গলময় ডাঙার পাশ দিয়ে চলেচে ওদের নৌকো। ঝোপের তলার ছায়ায় ডাহুক চরচে। বন্যার জলে নিমগ্ন আখের ক্ষেতের আখগাছগুলো শ্রোতের বেগে থরথর করে কাঁপচে।

ছইয়ের মধ্যে পিসিমা ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিস্তব্ধ ভাদ্র অপরাহ্ন। নৌকায় তক্তার ওপর বসে বসে হীরু কত কি ভাবছিল। এ গ্রামে যদি সে থাকতে পারত! মধুডাক্তারের মতো হাটতলায় ওষুধের ডিস্পেন্সারি খুলে?ডাক্তারীটা যদি শিখতো সে!

পুজোর বাজারটা ফিরবার সময় করতে হবে কলকাতা থেকে...অন্তত দেড়-শোটার বাজার। আসবার সময় খুব উৎসাহ করে সুরমার কাছ থেকে ফর্দ করে নিয়ে এসেচে...

একটা মানুষের মধ্যে মানুষ থাকে অনেকগুলো। জামালপুরের হীরু অন্যলোক, এহীরু আলাদা। এ বসে বসে ভাবচে, কুমীদের রান্নাঘরে অরন্ধনের নেমস্তম্ভ খেতেবসেছিল, সেই ছবিটা। অনবরত ওই একটা ছবিই।...

কুমী বলছে—আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?...

কুমী এখনও কি ঠিক তেমনি হাত-পা নেড়ে কথা বলে... ঠিক সেই ছেলেবেলাকার মতো! ...আচ্ছা, আর কারো সঙ্গে কথা বলে অমন আনন্দ হয় না কেন? সুরমার সঙ্গেও তো রোজ কত কথা হয়... কই...

রেলের বাঁশির আওয়াজে হীরুর চমক ভাঙলো। ওই স্টেশনের ঘাট দেখা দিয়েচে। সিগন্যাল নামানো, বোধ হয় ডাউন ট্রেনটা আসবার দেরি নেই...